নান্দনিক

বুদ্ধদেব গুহ

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

অফিস থেকে বাড়ি ফেরা মাত্রই তৃণা বলল, অফিসই করো। আর কিছু করতে হবে না।

অফিসে আজ নানা ঝামেলা ছিল। মুম্বাই থেকে নতুন - আসা পারচেজ ম্যানেজার খাণ্ডেলওয়াল মহা ঘুষখোর। খুব খাচ্ছিসখা, কিন্তু আমাকে শিখণ্ডি করে খেতে চায় সে। আমি বেঁকে বসতেই যত গণ্ডগোল। ঘুসখেকো লোকের অভাব কোনো দিনই ছিল না, কিন্তু আগে মানুষে ঘুষ খেতো খাবার বা রাবড়ি খাওয়ার মতো, এখন খায় ভাত টির মতো। ঘুস এখন ‘ত্রব্ধক্ষ্মাপুন্দ্ব ন্দ্রপ্সপ্সস্তু’ হয়ে গেছে।

প্রত্যেকের জীবনেই, সে - জীবন কাজেরই হোক কী গার্হস্থ্যর, অনেক কিছু অন্যায় অসহায়ভাবে মেনে নিতে হয়। মেনে নেওয়ার আরেক নামই জীবনযাপন। অথচ আমরা ছেলেবেলাতে পড়েছিলাম, যে ‘অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেনতৃণসম দহে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের কথা। রবীন্দ্রনাথ এবং আরো নানা বড় মানুষেও আমাদের জীবনের কম্পাসের মতো কত কিছুই বলে গেছেন, কিন্তু তার কতটুকুই - বা আমরা নিজের নিজের জীবনে কাজে লাগাতে পারি। পারি না যে, এটা একটা ট্র্যাজেডি।

মনটা খিঁচড়ে ছিল। খাণ্ডেলওয়ালের সঙ্গে সরাসরি বিরোধের পথে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ অফিসের হায়ার ার্কিতে সে আমার চেয়ে এক সিঁড়ি উঁচুতে অধিষ্ঠান করে। আমার পক্ষে তার কোনো ক্ষতি করা সম্ভব নয়, কিন্তু তার পক্ষে আমার ক্ষতি করা খুবই সহজ। আজকালকার এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে হায়ার অ্যান্ডফায়ারের বাতাবরণে মাইনে ও পার্কস যতই থাক না কেন, অনুক্ষণ অবচেতনে চাকরি চলে যাওযার ভয়টা শিরদাঁড়াতে শিরশির করে। অত্যন্ত কম মাইনে পাওয়া, কাজ - না - করা সরকারি কর্মচারীরা সে - তুলনায় দিব্যি থাকে। আড্ডা মারে, শীতের দিনে অফিসের বারান্দ াতে বসে পান সিগারেট খায়, রাজা উজির করে, সৌরভ- সানিয়া নিয়ে প্রবল বিত্রমে গলা ফাটায় - মানে নিজের নিজের কাজ ছাড়া আর সব কিছুই করে - করে, কারণ তারা জানে যে, তাদের চাকরি কখনো যাবে না।

তাদের চাকরি যায় না বটে তবে চরিত্র যায়, নিজেদের অজানিতে। যেসব মানুষের আত্মসম্মান চলে যায়, কাজ না করে য ারা মাইনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, পাবলিক সার্ভেন্ট হয়েও যাদের একমাত্র কাজ হয় পাবলিককে বিব্রত, ব্যতিব্যস্ত করা, তাদের অপদস্থকরা তাদের চরিত্র তাদের সন্তানসন্ততিকেও প্রভাবিত করে। সে - কারণেই একধরনের নিশ্চেষ্ট, আসল, ক াণ্ডজ্ঞানহীন, বুলিসর্বস্ব অপদার্থ বাঙালি শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে সমাজে। আমাদের চাকরি গেলে যাক, গেলেও অন্য জায়গ ায় চাকরি জুটিয়ে নেব কারণ আমরা কাজ জানি, কাজ করি, প্রচণ্ড খাটনিতে আমাদের অনীহা নেই। ঢিলেঢালা দিন কাট াতে কাটাতে ওইভাবে দিনে দিনে মানুষ হিসেবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার চেয়ে আমাদের এই টানটান পরিশ্রম ও টেনশানের জীবন অনেক ভালো।

সোমা, আমার সেক্রেটারি, হুমায়ূন আহমেদ সাহেবের একটি বই পড়তে দিয়েছিল -- চটি বই। বইটির নাম হিমু। ফেরার সময়ে গাড়িতে কয়েক পাতা পড়েই আটকে গেছি। ওঁর নাম শুনলেও আগে ওঁর লেখা পড়িনি একটিও। এবারের পুজো সংখ্যাতে ওঁর একটি উপন্যাস পড়ে চমকে গেছি। আমি ছেলেবেলাতে রংপুর ও বরিশালে ছিলাম। আমরা তে া উদ্বাস্তু, আমাদের সব আত্মীয় - স্বজনই উদ্বাস্তু। মনে মনে আমরা পুবদিকেই রয়ে গেছি। তাই হয়তো হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্ট

চরিত্রগুলোকে অত চেনা মনে হয়। এত ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। তবে আমরাই শেষ প্রজন্ম। আমাদের ছেলেমেয়েরা বা বন্ধুবান্ধবের ছেলেমেয়েরা বলে শুনেছি, দেশ ছিল ঢাকায়, বা বরিশালে, বা পাবনায়, বা কুমিল্লায়, বা রাজশাহীতে, কিন্তু যাইনি কখনো।

---কোন পাড়ায় ছিল বাড়ি?

---সেসব জানি না। এ ঠাকুর্দারা বলতে পারবেন।

ওরা হুমায়ূন আহমেদের লেখাকে সাহিত্য হিসেবে হয়তো পড়বে, তবে রস পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারবে না। 'ওরা' বলতে পশ্চিমবঙ্গী তণরা। পূর্ববঙ্গের ছেলেমেয়েরা অবশ্যই পারে --- না পারলে তাদের মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ এত জনপ্রিয় কেন? আর কেনই - বা তিনি একটি দ্বীপের মালিক, বা মার্সিডিজ গাড়ি চড়েন, বা কেনই তাঁর বসার ঘরে সুইমিংপুল থাকবে।

কী কথা থেকে কী কথাতে চলে এলাম। হচ্ছিল হিমুর কথা - ভাবছিলাম খাঙ্কেলওয়ালের কথা তার মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ উড়ে এসে জুড়ে বসলেন। ভাবনার ঘোড়ারা এমনই করে। মহীনের ঘোড়াগুলির মতো মাথার মধ্যে দাপাদাপি করে, ধুলো ওড়ায়। ক্ষুরের ঘর্ষণে বিদ্যুতের চমকানি তোলে।

।। দুই ।।

যা বলছিলাম। অফিস থেকে ফেরা মাত্রই তৃণা বলল, অফিসই করো। আর কিছু করতে হবে না।

টাইটা খুলতে খুলতে বললাম, কেন? হলোটা কী?

--- কী আবার হবে। আমার দু- দুখানা শাড়ি চুরি হয়ে গেছে। পনেরো কুড়ি হাজার করে দাম। ছুটকি কিনে দিয়েছিল, যখন চেন্নাইতে ছিল, তখন ক্রেডিট কার্ডে।

--- পনেরো - কুড়ি হাজার দামের শাড়ির প্রয়োজনই - বা কী? তুমি কুমড়োপটাশ হয়ে যাবার পরে শাড়ি তো আর পরোও না, সালোয়ার কামিজই পরো। সেই পোশাকে তোমাকে কেমন দেখায়, তা একদিন বড় আয়নাতে দেখো। তোমার মেয়েও তো শুধু জিনিস আর টপসই পরে। নইলে সালোয়ার কামিজ। শাড়ি আলমারিতে থাকল, না চুরি হলো তাতে কী যায় আসে!

--- বাজে কথা বন্ধ করো। তোমার ছেলে এবং মেয়ে দুজনেই বলেছে এ - কাজ নন্দনেরই কাজ। ওরা একটু পরেই থানায় যাবে।

নন্দনই যে নিয়েছে, তা ওরা জানল কী করে! তোমার আয়া বা বাদল যে নেয়নি, তা জানলে কী করে? কারোকে দিয়ে দাওনি তো ? তোমার ঘরে আর যারা আসে মনে করে দেখো তো?

--- অত দাতা আমি নই।

--- তা অবশ্য নও। দাতা যে তুমি নও, তা আমি জানি।

বাথম থেকে ফিরে এসে ঘরের কোণের ইজিচেয়ারে বসে আমি বললাম, ভুলে যেও না যে, ছুটকি যখন চেন্নাইতে ছিল তখন ছ বছর নন্দন সেখানে গিয়ে থেকেছে, রান্নাবান্না করে ওকে দেখাশোনা করেছে। ওর কলকাতার চেনাপরিচিত, ঝাড়খণ্ডের আত্মীয়স্বজন সবাইকেই ছেড়ে গেছিল ও। এখন ছুটকি, অর্থাৎ মি ওদের কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছে। তার পেছনে নন্দনেরও অবদান ছিল। নন্দন তখন যা মাইনে পেত তার চেয়ে দুশো টাকা বেশি পায় এখন। তোমার পেডিকিওরের খরচও তার চেয়ে বেশি।

আমরা আমরা। আমাদের সঙ্গে ছোটলোকদের কী? তাছাড়া ওদের অবদান আবার কী? মোটা মাইনে পাচ্ছে, তার বদলে কাজ করছে। এর পেছনে অবদান - ফবদান কী আছে? তোমার কোম্পানি তোমাকে কালই ফায়ার করে দিতে পারে পান থেকে চুন খসলেই -- তারা কি তোমার অবদান - টবদান বিচার করবে? আমি কিছু জানি না। ওকে আমি কাল সকাল থেকে কাজে আসতে বারণ করে দিয়েছি।

--- ইতিমধ্যেই বলে দিয়েছ? তাহলে আমার মতামতের আর দরকার কী?

--- দরকার নেই। তবু তোমাকে বলা দরকার তাই বললাম

--- ঠিক আছে। আমি তো এ বাড়িতে নন-এনটিটি। আমার একমাত্র ভূমিকা টাকার --- সাপ্লায়ারের। আমি রোজগার করি, তুমি খরচ করো।
--- ছাড়ো তো! আমি ছবি বিত্রি করে অনেক টাকা আয় করি মাসে। তোমার টাকায় কতটুকু হয়? বেশি ফুটানি করো না।
-- ঠিক আছে।
--- অবশ্যই ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।
--- যাও।

।। তিন ।।
তৃণা চলে গেলে আমি ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সামনের কুশানমোড়া টুলটার ওপরে পা তুলে দিলাম। আজকাল পা - টা ফুলছে। পা ঝুলিয়ে বসলে তো ফোলেই, রাতে শুয়ে থাকলেও ফোলে। বাথমে যেতেও অসুবিধা হয়। আমার দুই ড াক্তার অনেক টেস্ট করিয়ে চশমা নাকে দিয়ে রিপোর্ট - টিপোর্ট নাড়াচাড়া করেও কোনো সুরাহা করতে পারেননি। আজক ালকার ডাক্তারদের কাছে টাকাই সব। আগের মতো ভগবান তাঁরা কেউই নন। পার্টি পিকনিক, ক্লাব, শুত্রবার রাতের হুল্লোড়, শনিবার পরিবারের সঙ্গে ছবি দেখা, ফাইভ স্টার হোটেলে খাওয়া এবং রবিবারে ছুটি কাটানো এখন সব ডাক্ত ারেরই টিন। রাতে ডাকলে কেউই আসেন না। শুধু ডাক্তারই - বা কেন এখন, অধিকাংশ পেশাদারেরাই বিবেকহীন টাকা রোজগারের মেশিন। ওষুধ কোম্পানির পয়সায় সারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন সপরিবারে। কোনো কমিটমেন্ট নেই, রে াগীর প্রতি দয়া মায়া মানবিকতা কিছুই নেই। চোর ডাকাতের নানারকম হয়। নন্দন যদি চোর হয় তবে এঁরাও চোর। শ্বাস চুরিটাও চুরি।
এমন সময়ে নন্দন এসে ঘরে ঢুকল। ও-ই আমার দেখাশোনা করে, আমাকে চারবেলা ওষুধ দেয়, আমার মোবাইল ফোনে চার্জ দেয়, আমার কোমরে সেক দেওয়ার ইলেকট্রিক কুশান বিছানায় পাশে প্লাগ করে রাখে। রাতে খাওয়া - দাওয়ার পর অল - আউট লাগিয়ে দেয় মাল্টিপ্লাগে। ছেলেটা ঝাড়খণ্ডি, বছর কুড়িও হবে না বয়স, কিন্তু অসম্ভব বুদ্ধিমান। ইংরেজি বাংলা শিখে নিয়েছে, আমারমোবাইলে সব নাম্বার স্টোর করে দেয়। ফোন এলে ফোন নাম্বার ও নাম লিখে র াখে। মোবাইলে নাম্বার ডেকে দেয়, ল্যান্ডলাইনেও নাম্বার ডেকে দেয়, বলতে গেলে বাড়িতে ও-ই আমার সেক্রেটারি। আ মি আলাদা ঘরে শুই। রাতে ও-ই আমার খাওয়ার নিয়ে আসে। খাওয়া হয়ে গেলে ওষুধ দেয়। শুলে গায়ে কম্বল দিয়ে আলো নিভিয়ে চলে যায়। কখনো টিভি দেখলে টিভির রিমোট, টিভি দেখার চশমা হাতের কাছে গুছিয়ে দেয়, যখন চিঠি পড়ি বা লিখি তখনো পড়ার চশমা হাতের কাছে এনে দেয়। আমি ওষুদের নাম মনে রাখি না। কোনোদিনই না। ও-ই সব ওষুধ দেয়। ও নইলে আমি কানা। এইসব কিছুই ভাবল না তৃণা। একটা কাল্পনিক ধারণাতে ওকে ছাড়িয়ে দিল। গত পাঁচ বছরে ওই আমার ছেলে হয়ে গেছিল। আমার ছেলে তো বড় চাকরি করে, ডেট করে, কার্ডে দামি দামি জামা জুতো কেনে, ই- মেইল আর মোবাইলের ওপরেই থাকে, প্রতি শুত্রবার রাতে ডিসকোতে যায়। তার নতুন সেন্ট্রো গাড়ি চালিয়ে ক্লাব অ ার হোটেলবাজি করে। সংসারে এক পয়সাও ঠেকায় না। ওকে আমার কিছু বলতে লজ্জা করে। মা, মেয়ে আর ছেলে মিলে একটা আলাদা দল।আমি এক দ্বীপ। এই একটা ঘরই আমার সর্বস্ব। আমি কোনো অতিথি ডাকতে পারি না বা ড়িতে, কেউ এলে নানারকম কৈফিয়ত দিতে হয় । আমি নিজে কখনো খিচুড়ি খেতে চাইলে দশ দিনের নোটিশ দিতে ল াগে। তারা যা মাছ ভালোবাসে, যে রান্না ভালোবাসে শুধু তাই - ই হয় বাড়িতে। আমার হুইস্কি সোডা বা ছুটির দিনের বিয়ার বা ভদকা নন্দনই ট্রেতে গুছিয়ে ট্রলি করে নিয়ে আসে -- বিটার্সের শিশি, সোডা, বরফ। ও চেলে গেলে আমি অসহায় হয়ে যাব। এ কথা তৃণা জানে বলেই হয়তো বাড়িতে আর দুজন কাজের লোক থাকা সত্ত্বেও ওকেই ছাড়িয়ে দিলো।

।।চার ।।
নন্দনের অনেকই গুণ ছিল, কিন্তু একটা দোষ ছিল, যে - দোষ গরিবদের মানায় না। ওর খুব বড়লোক হবার ইচ্ছা ছিল। তবে ওকে দোষ দিতাম না আমি। টিভি দেখে দেখে ওর মনে অনেক কিছুর লোভ জেগেছিল। তবে ওর বড়লোক হবার

পথে কোনো বাধা ছিল না। বড়লোক হবেও ও নিশ্চয়ই একদিন। আর ওর যা আই - কিউ, তাতে ও একটু লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেলে ও - ই আমার বস্ হতো, ওর অধীনেই কাজ করতাম আমি। বাংলা ইংরেজি কাগজ নাড়াচাড়া করতে করতে ও এই দুই ভাষাই পড়তে শিখে গেছিল মোটামুটি। হিন্দি তো জানেই। ওর বাড়ি ছিল ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে। ওর বাবা বাসের ড্রাইভারি করত। ও নিজেও দুপুরে ড্রাইভিং স্কুলে ড্রাইভিং শিখত। কতদূর শিখেছে জানি না। আমার দুটি গাড়ি, কিন্তু একজনই ড্রাইভার। ড্রাইভার ভালো এবং প্রায় দশ এগারো বছর হলো কাজ করছে। গত পাঁচ বছর হলো আমি গাড়ি চালানো ছেড়ে দিয়েছি। দ্বিতীয় গাড়িটি নিয়ে কখনো সখনো ওই ড্রাইভারইমেয়ের ডিউটি করে। মেয়ে মাতি এস্টিম পছন্দ করে। ভেবেছিলাম, নন্দন লাইসেন্স পেলে এবং অন্য কোথাও দু - একবছর গাড়ি চালিয়ে হাত পাকিয়ে এলে ওকে আমার পার্সোনাল ড্রাইভার করে রেখে দেবো। নিজে গাড়ি না - চালানোর কারণে ইচ্ছে করলেই গাড়ি নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে যাওয়া যায় না -- আগে যেমন প্রায়ই যেতাম, বিশেষ করে সপ্তাহান্তে।

নন্দনের ভাবনা বন্ধ করে হুমায়ূন আহমেদের হিমু বইটি তুলে নিলাম হাতে। পুজোর উপন্যাসটি পড়ার পরেই একটি চিঠি লিখব ভেবেছিলাম ওকে কিন্তু ঠিকানা জানি না। আজও ঠিকানা জোগাড় করে উঠতে পারিনি। এমন সময়ে নন্দন ঘরে ঢুকল।

আমি মাথা নিচু করে ফেললাম। তারপর যখন বুঝলাম যে, ও আমাকে কিছু বলতে চায়, তখন পড়া থামিয়ে ওর দিকে চাইলাম।

বললাম, কিছু বলবি? মা তোকে কিছু বলেছেন?

-- হ্যাঁ।

-- কী?

-- কাল থেকে কাজে আসতে বারণ করেছেন।

-- কেন?

-- আমি নাকি মায়ের শাড়ি চুরি করেছি।

-- নতুন শাড়ি?

-- না, পুরনো শাড়ি। দিদি চেন্নাই থেকে কিনে এনেছিল।

-- তুই চুরি করেছিস?

-- মা যখন বলছেন তখন করেছি। দিদি থানাতে যাচ্ছিল, তারপর কী মনে করে যায়নি।

-- থানায় গেলে কী হতো তুই জানিস?

-- জানি বাবু। আপনি নামি লোক। আপনার নাম করে ফোন করলেই গাড়িভর্তি পুলিশ বাড়িতে চলে এসে আমাকে ধরে নিয়ে যেত। হয়তো খুব মারত, কিন্তু যে চুরি করেনি তাকে চোর বানাতে তো পারত না।

-- মা বলছিলেন, তুই মোবইল ফোন কিনেছিস নাকি? টাকা কোথায় পেলি?

-- দুপুরে মাড়োয়ারির গুদামে মাল খালাস করে। মোবাইল ফোন খুব কাজের বাবু। আমার বাবাও একটা কিনেছে। আমারখবরও নেয়, আমিও বাড়ির সব খবর পাই। আমার নানা - নানি এখনো বেঁচে আছে। নানি আমায় খুব ভালোবাসে। একদিন বাবা নানির সঙ্গেও আমার কথা বলিয়ে দিয়েছিল। গতবারে যখন ছুটি নিয়েছিলাম তখন আমাদের জমিতে ইট তৈরি করে বিক্রি করে অনেক টাকা রোজগার হয়েছিল। কারো বাড়িতে কাজ করে কি জীবন চলে বাবু? ব্যবসা বা স্বাধীন পেশা না থাকলে কিছু হয় না। আমরা যদি কিছু টাকা জমাতে পারতাম, তাহলে ব্যাংক থেকে ধার নিয়ে একটা টেম্পো কিনতাম। তারপর তার ধার শোধ হয়ে গেলে একটা ট্রাক।

-- তুই ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে গেছিস?

-- না বাবু। আর পনেরো দিন পরে পাব। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আপনি মাকে কিছু বলবেন না।

-- না। মা কি আমার কথা কখনো শুনেছেন? বলে লাভ কী?

তারপর বললাম, যা ঠান্ডা পড়ছে দুদিন হলো, কোথায় থাকবি এই পনেরো দিন? তোদের নিচের কোয়ার্টারেই থেকে যা না। খাবি নাহয় বাইরে।

-- না। তা হয় না বাবু। আমি তো চোর। বললাম, মনে দুঃখ পাস না। তোর মা ওইরকমই। মানুষটা খারাপ নয়।
-- জানি না।
তারপর বলল, গরিবের অত সহজে দুঃখ পেলে চলে না বাবু। গরিবের দুঃখবোধ কম, কিন্তু মনে করেছিলাম দিদিদের নিজের দিদি। আমার তো কোনো দিদি নেই। ছোট বোন অবশ্য আছে একটা । আপনি একদিন বলেছিলেন ছোট বোনটার বিয়ে আপনি দিয়ে দেবেন।
বললাম, এখনো বলছি। তোর বোনের বিয়ে ঠিক হলে আমাকে জানাস মোবাইলে -- তুই তো নাম্বার জানিসই -- নইলে অফিসের ঠিকানাতে চিঠি লিখিস, ঠিকানা তো জানিস।
--- না। তা আর হয় না বাবু। চোরের বোনের বিয়ে আপনি দিতে যাবেন কেন? ও বড় হতে হতে আমি আর বাবা মিলে অ ামাদের অবস্থা ফিরিয়ে ফেলব। আমরাই দেবো ওর বিয়ে যেমন করে পারি।
-- তুই আজ আমার খাওয়ার নিয়ে আসবি না?
-- আনব তো। আজ হুইস্কি খাবেন না?
-- না। আজ ইচ্ছে করছে না রে। তুই আধঘন্টা পরে খাওয়ার নিয়ে আয়।
-- রান্না হয়নি এখনো রাধাদিদি বলল। ঘন্টাখানেক লাগবে আরো।
-- তবে বিছানা করে দে। আর নিয়েই আয় সোডা আর বরফ -- দুটো হুইস্কি খাইই। ওষুধগুলো সব দিয়ে যাস খাবার পরে। কাল থেকে আমার ওষুধ কে দেবে?
-- বাদলই দেবে। বিষ্ণুকে সব বুঝিয়ে দিয়েছি। ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশন আর দোকানের ক্যাশমেনোও ওকে দিয়েছি। ও আমার চেয়েও বুদ্ধিমান। কোনো অসুবিধে হবে না আপনার।

।। পাঁচ ।।
নন্দন সোডা বরফ এনে সেলার খুলে হুইস্কি বের করে দিল। তারপর ঢেলেও দিল গ্লাসে। কতখানি সোডা কতখানি জল ও সব জানে। আমি বললাম, বাড়িতে আর দু-তিনজন কাজ করে, তুই - ই চুরিটা করেছিস তা মা বুঝলেন কী করে? তোর কী মনে হয়?
ও একটু চুপ করে থেকে বলল, মা যা বোঝেন তাই - ই ঠিক। মায়ের চেয়ে বেশি আর কেউই বোঝেন না।
-- কাল সকাল থেকে তোর সঙ্গে তবে আর দেখা হবে না?
-- কেন, হবে তো। মা বলেছেন কাল সকালে টাকা দেবেন এ - কদিনের। সকালে যখন আসব তখন আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব বাবু।
-- অবশ্যই দেখা করে যাস। আর ড্রয়ার খুলে আমার পার্সটা দে তো।
আপনার পার্স, কত দামি ঘড়ি, কত দামি কলম, সব তো এমনিই পড়ে থাকে। আপনি তো এক ঘড়ি আর একই কলম নিয়ে কখনো অফিসে যান না বাবু, রোজই বদলান, কিছু কি চুরি গেছে বাবু কখনো? নিজের সম্মানই চলে গেলে আর কী নিয়ে বাঁচব বাবু? এমনিতেই তো অনেক কষ্ট।
পার্স থেকে দুটি পাঁচশো টাকার নোট বের করে বললাম, এটা রাখ। খেতে তো টাকা লাগবে এ-কদিন।
নন্দন কোনো কথা না বলে টাকাটা নিল
আমার খাওয়া হয়ে গেলে ওষুধটাষুধ দিয়ে, গায়েৰ উপরে কম্বলটা টেনে দিয়ে জানালাগুলোর পর্দা টেনে অল - অলঅউট জ্বেলে, বাথমের দরজাটা খুলে দিয়ে বল, আসছি বাবু, কাল দেখা করে যাবো যাওয়ার সময়।

।। ছয় ।।
সারারাত বুকের মধ্যে ভারি একটা কষ্ট বোধ করলাম। বিছানাতেই অ্যালজোলাম রাখা থাকে। নন্দন বলত নীলা দেগা? ইয়া লাগ? মানে পয়েন্ট টু ফাইভ না পয়েন্ট ফাইভ? নিজেই একটা পয়েন ফাইভ, অ্যালজোলাম খেয়ে নিলাম রাত বারে াটা নাগাদ উঠে পড়ে। প্রত্যেক দিন খবরের কাগজ আর চা নিয়ে এসে নন্দনই ঘরের পর্দাগুলো সরায়, মাথার দিকের অ

ালোটা জ্বালিয়ে দেয় -- এখন সকালের দিকে কুয়াশার জন্য আলো ভালো ফোটে না।
চোখ মেলে ওয়ালক্লকটার দিকে চেয়ে দেখলাম পৌনে আটটা বাজে। রিমোট কন্ট্রোল বেলটা টিপলাম। বাদল এলো। ক াগজ নিয়ে। বলল, চা নিয়ে আসছি বাবু।
-- নন্দন কোথায়? আসেনি?
বাদল বলল, এসেছিল। মা দরজাতে দাঁড়িয়েই একদিনের টাকা দিয়ে দিয়েছেন। ভেতরে ঢুকতে দেননি।
-- সে কী রে! আমাকে যে বলে গেল কাল রাতে, আজ যাওয়ার আগে দেখা করে যাবে।
-- ভিতরে আসতেই না পারলে কী করবে বাবু।
বাদল বলল, মুখ নামিয়ে।
তারপর নিচু গলাতে বলল, চা নিয়ে আসছি। ভাবছিলাম। ঝাড়খণ্ডে মাওবাদীদের খুব দৌরাত্ম্যের খবর পড়ি কাগজে। নন্দনের ঠিকানা আমার কাছে নেই। তৃণার কাছে আছে। ভাবলাম, ওকে একটা চিঠি দিয়ে দিই, বলি যা, ভিড়ে যা ওদের দলে। তৃণা আর আমার বুর্জোয়া ছেলেমেয়েরা তাদের মানসিকতায় নন্দনদের কোনোদিনও বুঝবে না। সমস্ত ক্ষমতার উৎসই হয়তো বন্দুকের নলই। কেজানে! মাও জে - ডঙের কথাই হয়তো ঠিক।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com